সাবাস বাংলাদেশ!

ইলিশ উৎপাদনে ১ম

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ২য়

জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ৩য়

চাল উৎপাদনে ৪র্থ

আলু উৎপাদনে ৬ষ্ঠ

আউটসোর্সিং-এ ৮ম

১ম
পাট রপ্তানিতে
(উৎপাদনে ২য়)

২০২১।
কোয়ান্টাম শুরু করেছে তার ২৯ তম বছরের পথচলা। আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি সেবা সমমর্মিতা ও দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি সূচনা ঘটেছিল যে সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগের, ২৮ বছরের কালপরিক্রমায় জাতীয় জীবনে তা হয়ে উঠেছে আস্থা ও কল্যাণের প্রতীক।

প্রায় তিন দশক আগে কোয়ান্টাম যে স্বপ্নের কথা নিঃসংকোচে তুলে ধরেছিল জাতির সামনে, তাকে সত্য প্রমাণ করেই লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলেছে জাতি। উন্নয়নের চিরায়ত ধারণা, বিশেষজ্ঞদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, আরোপিত কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে প্রিয় বাংলাদেশ।

৯০-এর দশকের গোড়ায় সাধারণ নাগরিক আলাপ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর কিংবা বিশ্লেষণী কলাম, কোথাও যখন ভুল করেও উচ্চারিত হতো না দেশ নিয়ে কোনো আশাবাদ, সেই অসম্ভব সময়ে বিশ্বের শীর্ষ দশ জাতির এক জাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার যে মনছবি উপস্থাপন করেছিল কোয়ান্টাম—সময়ের পথ ধরে তা-ই আজ বাস্তব। একাধিক সূচকে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রবেশ করেছে শীর্ষ দশে। বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রনেতা, অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, বিশ্লেষকবৃন্দও এখন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এ পর্যায়েই জাতির জীবনে সবচেয়ে বেশি দরকার নৈতিকতা, মানবিকতা, সমমর্মিতার স্ফূরণ; শুদ্ধাচার চর্চার মধ্য দিয়ে যা হয়ে ওঠে স্থায়ী। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিকসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যত বেশি মানুষ শুদ্ধাচারী হয়ে উঠবে, তত সার্থক হবে আমাদের জাতিগত উত্থান।

কোয়ান্টাম বর্ষ ২৯ হোক
শুদ্ধাচারের বছর
আসুন শুদ্ধাচারী হই

কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়

৩য়
সবজি উৎপাদনে

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ৮ম

মাছ উৎপাদনে ৪র্থ

ওয়ানডে ক্রিকেটে ৭ম

জনশক্তিতে ৮ম

পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম

বাইসাইকেল রপ্তানিতে ৮ম

ছাগল উৎপাদনে ৪র্থ

আম উৎপাদনে ৭ম

মৌসুমি ফল উৎপাদনে ১০ম

কোয়ান্টাম বুলেটিন

জানুয়ারি ২০২১ | quantummethod.org.bd

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম
এক অসামান্য কর্মীপুরুষ

জন্ম : ১ এপ্রিল ১৯২৮; মৃত্যু : ২৪ জানুয়ারি ২০১৩

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম মেথড। ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে শিথিলায়ন ক্যাসেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেদিন প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

মুক্তজ্ঞান ও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি সেদিন বলেছিলেন—'কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে এটি যুক্ত হলে রোগ নিরাময় আরো সহজ হবে, ত্বরান্বিত হবে।' সেদিন কোয়ান্টামের সামনে ছিল না কোনো বাস্তব উদাহরণ। কিন্তু তিনি তার দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার আলোকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে কোয়ান্টাম মেথডকে স্বীকৃতি দিলেন 'বিজ্ঞানভিত্তিক' ও 'কার্যকরী' প্রক্রিয়া হিসেবে। তিনি কত দূরদর্শী তার প্রমাণ—অধ্যাপক নুরুল ইসলামের এ বক্তব্যের ১০ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের NIH (National Institute of Health) মেডিটেশনকে স্বীকৃতি দেয়।

গত ২৮ বছরে কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে সুস্থ ও সুখী জীবন গড়েছেন লাখো মানুষ। কোয়ান্টামের এই সাফল্যযাত্রার ২৯ তম বছরে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি প্রয়াত ডা. নুরুল ইসলামকে।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম আমাদের জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। ধন্বন্তরি চিকিৎসক, নির্ভীক সত্যবাদী, বহুল প্রশংসিত জাতীয় ওষুধ নীতির প্রণেতা, ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ, বাংলাদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তিত্ব, দেশের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—এমন অসংখ্য পরিচয় তাকে আসীন করেছে সর্বজনশ্রদ্ধেয় আসনে। আমৃত্যু তিনি ছিলেন মানবসেবায় একনিষ্ঠ ও অতন্দ্র।

জন্মলগ্ন থেকেই কোয়ান্টামের একজন সত্যিকার অভিভাবক ছিলেন ডা. নুরুল ইসলাম। অশীতিপর এই সেবাব্রতী পাহাড়ি রাস্তার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গিয়েছিলেন বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম-এ। চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন কোয়ান্টাম আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্পে।

প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ফাউন্ডেশনের একাধিক আয়োজনে। নিঃসংকোচে ব্যক্ত করেছেন তার অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের কথা। এখানে তুলে ধরা হলো সে-সব বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ :

মেডিটেশন রোগ নিরাময়কে ফলপ্রসূ করে

আমরা যাকে রোগ বলি তার অধিকাংশই আসলে এক ধরনের টেনশন বা মনের অস্থিরতা। তাই এ থেকে পূর্ণ নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজন মানসিক পরিবর্তন অর্থাৎ মনকে শক্তি দেয়া, সাহস দেয়া—যা টেনশনমুক্তির অন্যতম উপায়।

সব রোগের চিকিৎসা হয় না। আবার অনেক রোগের চিকিৎসার দরকার নেই। উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোতে ৪০ শতাংশ লোকের চিকিৎসা ও ওষুধের প্রয়োজন হয় না। সৎ-উপদেশ, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং প্রশান্তি এসব রোগ থেকে মুক্তির উপায়। মেডিটেশন মানুষের মনে প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে রোগ নিরাময়কে ফলপ্রসূ করে। এটি এখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত।

ভালো উদ্যোগের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করি নি

সৎপথে থেকে সাহসের সাথে এগিয়ে চলা আমার স্বভাব। আমার মতে, আন্তরিকতা এবং জীবনস্রোতে সততা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সে কারণেই পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যখন যেভাবে সুযোগ পেয়েছি সমাজের জন্যে কাজ করেছি। সমাজের যে-কোনো ভালো উদ্যোগের পাশে দাঁড়াতে কখনো দ্বিধা করি নি। কোয়ান্টাম হলো এমনই একটি উদ্যোগ।

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে শিথিলায়ন ক্যাসেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি শিথিলায়ন ক্যাসেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। কারণ অসুস্থ, অস্থির-অশান্ত আধুনিক মানুষের জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আসতে পারে মেডিটেশনের মাধ্যমে। আমি তখনই উপলব্ধি করি, যে-সব রোগের ওষুধের প্রয়োজন নেই, কোয়ান্টামই হতে পারে তার নিরাময়ের সার্থক বিকল্প।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চাই বিশ্বাস এবং আশা

আসলে শরীরের চেয়ে মন অনেক বেশি শক্তিশালী। মনের গতি, শক্তি, পরিধি সবই ব্যাপক। মনের এই দুর্দমনীয় শক্তির প্রভাবে শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এমন কিছু পদার্থ তৈরি হয় যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, এমনকি রোগ নির্মূলেও সাহায্য করে।

নজরুলের একটি কবিতায় আছে—*বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেও না তাহার কাছে // নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।* তাই সবাইকে বলি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বাস এবং আশাকে সঙ্গী করে রাখবেন। এই আশা এবং বিশ্বাসই আপনাকে সুস্থ করে তুলবে, সাফল্য এনে দেবে।

কোয়ান্টামের সদস্যদের সুস্থতার মূলেও রয়েছে এই বিশ্বাস। বিশ্বাস করে এগিয়ে এসেছেন বলেই তারা আজ সুস্থ ও রোগমুক্ত। একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি বলতে পারি, কোয়ান্টামের কার্যকারিতা এখন প্রমাণিত সত্য, যা সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

সুস্থ জীবনের জন্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করুন

যুগে যুগে মহামানবেরা, নবী-রসুলরা বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ধ্যানের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। এটি তাই নতুন কিছু নয়। এটি হাজার বছরের শাশ্বত চেতনারই একটি আধুনিক ও সমন্বিত রূপ, যার উৎস এই প্রাচ্য।

তাই বলি, আপনার সুস্থতা ও নিরাময়ের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। তাই সুস্থ জীবনের জন্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করুন। অর্থাৎ ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞচিত্ত হোন। প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। নিয়মিত হাঁটুন, ব্যায়াম করুন এবং টেনশনমুক্ত জীবনযাপন করুন। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বাস এবং আশা নাই যার, তার কাছ থেকে দূরে থাকুন। সবসময় আশাবাদী, বিশ্বাসী ও ভালো মানুষদের সংস্পর্শে থাকুন। আপনি ভালো থাকবেন।

নতুন বছরে যত্নায়নে আসুক নতুন গতি

গত ২৮ বছর ধরে যে জীবন-অভ্যাসগুলোর ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে আসছে কোয়ান্টাম, সেই একই কথা আজ বলছেন বিশ্বের প্রথমসারির চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য-গবেষকরা। তাদের মতে, বিনামূল্যে পাওয়া দেহটার যত্ন না নিলে দিনে দিনে যে ক্ষয় হয়, তার পরিণতিই রোগব্যাধি। তাই ছোট ছোট সহজ কিছু নিয়ম মেনে চলুন, নিজের যত্ন নিন। কারণ তা-ই ভালো থাকে যার যত্ন নেয়া হয়।

সকালের নাশতায় অবহেলা নয়

দেরিতে ঘুমানো, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা এবং সকালের নাশতা না করেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে প্রাণপণে ছুটতে থাকা—আধুনিক জীবনে এ এক চিরচেনা দৃশ্য। অথচ বিজ্ঞানীদের মতে, দেহের জন্যে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার হলো সকালের নাশতা। ২০১৩ সালে ইটালিয়ান জার্নাল অব পেডিয়াট্রিকস-এর রিপোর্ট অনুসারে, সকালের স্বাস্থ্যকর নাশতা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ অক্ষুণ্ন রাখে।

দিনের শুরুতে ধ্যান

দিনের শুরুতে আধাঘণ্টার মেডিটেশন আপনাকে দেবে সারাদিনের প্রস্তুতি। নিজের মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা দেখে নিজেই বিস্মিত হবেন। সেইসাথে কাজে আসবে গতি, কমবে ভুলের পরিমাণ এবং যে-কোনো পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে। আর একথা নিশ্চয়ই নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে, ধ্যানীদের সুস্থতার হারও তুলনামূলক বেশি।

ইয়োগা ও দমচর্চা করুন

দৈহিক নিষ্ক্রিয়তা ও রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন ইয়োগা চর্চা করুন। ইয়োগা শুধু বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা পেশির ব্যায়াম নয়, এটি দেহ-মনের সমন্বিত এক পদ্ধতি, যা দেহের হরমোন প্রবাহ স্বাভাবিক করে, স্নায়ু ও পেশি সুস্থ রাখে এবং অক্লান্ত কাজ করার শক্তি জোগায়।

অক্সিজেনের ঘাটতি থেকেই সৃষ্টি হয় ক্লান্তি ও অবসন্নতা। সারাদিন ঝরঝরে ও কর্মোদ্যমী থাকতে যখনই সময় পাবেন বুক ফুলিয়ে দম নিন।

পরিচ্ছন্ন থাকুন

প্রতিদিন স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে গোসল করুন। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এটি অত্যন্ত কার্যকর। গোসল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেহকে টক্সিনমুক্ত করে এবং স্ট্রেস কমায়।

মস্তিষ্ককে অলস রাখবেন না

মস্তিষ্ককে যখনই নতুন চিন্তা, পরিকল্পনা বা চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়, তার অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে নতুন কর্মকাঠামো। তাই শেখার আগ্রহ বা ইচ্ছায় কখনো ইতি টানবেন না। হোক তা কোনো ভাষা শেখা, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, রান্না, সোয়েটার বুনন, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ড্রাইভিং, সাঁতার বা সৃজনশীল লেখালেখি—প্রতিটি নতুন চ্যালেঞ্জ আপনাকে দেবে জয়ের আনন্দ এবং আত্মবিশ্বাস।

ঘুম হোক পর্যাপ্ত

ঘুম প্রাকৃতিক মহৌষধ। তাই কর্মব্যস্ত দিনের শেষে রাতে পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন। ঘুমের ঘাটতি হলে বাইরে থেকে শুধু ক্লান্তির অনুভূতিটা টের পাওয়া যায়। অথচ দেহের ভেতরে ক্ষয়টা আরো অনেক বেশি—চিন্তাশক্তি এবং কর্মশক্তি দুই-ই হ্রাস পায়।

সঙ্গী হোক ডায়েরি

দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে, তারা তুলনামূলক বেশি প্রাণবন্ত এবং গোছানো। আটপৌরে জীবনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, প্রাপ্তি, কর্মপরিকল্পনা লিখে ফেলার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির দেহ-মন-আবেগের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি হয়, যা মনোদৈহিক সুস্থতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হিসাব-নিকাশে যন্ত্র-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসুন

প্রতিদিনই কিছু না কিছু হিসাব-নিকাশ আমাদের করতেই হয়—কখনো বাজার-সদাই, কখনো সারা মাসের জমাখরচ, কখনো-বা গৃহ-সহযোগীদের বেতন-ভাতা। এই যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগে যন্ত্রের নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসুন। অর্থাৎ ক্যালকুলেটর বা স্মার্টফোনের সাহায্যে নয়, হিসাব করুন নিজে নিজে। এতে আপনার মস্তিষ্কের সক্ষমতা বাড়বে।

থাকুক সহজ একটি রুটিন

কাজ শুরু করতে পারেন অনেকেই কিন্তু সময়ের মধ্যে কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন তারাই, যারা রুটিন করে কাজ করেন। ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডের শক্ত বাঁধনে বাঁধা নয়, রুটিন হওয়া চাই সহজ এবং অনুসরণযোগ্য।

পারস্পরিক সম্পর্কে যত্নশীল হোন

পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও কর্মক্ষেত্রের মানুষগুলোর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, তার ওপর নির্ভর করে আপনার প্রতিদিনের ভালো থাকা। তাই সুস্থ থাকতে হলে, প্রশান্তিতে থাকতে হলে পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে সম্মান করুন। রাগ-ক্ষোভ জমিয়ে না রেখে সরাসরি কথা বলুন। ক্ষমা চাইতে শিখুন। ক্ষমা করতে শিখুন। সবাইকে আগে সালাম দিন। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলুন।

প্রকৃতির সাথে হোক বন্ধুত্ব

প্রকৃতিকে এড়িয়ে সুন্দর সতেজ জীবন সম্ভব নয়। তাই সুযোগ করে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটান। সূর্যের আলোর উষ্ণতা, সবুজ কচি ঘাসের স্পর্শ, ফুলের ঘ্রাণ শুধু প্রশান্তিই দেয় না, তা সার্বিক সুস্থতার জন্যেও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

মন ভরে থাকুক ইতিবাচক চিন্তায়

সচেতনভাবে নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। অভিমান-অভিযোগ এবং চারপাশের মানুষগুলোর সাথে মনে মনে তর্ক করার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসুন। নিজেকে ও অন্যকে নিয়ে কল্যাণচিন্তায় ব্যস্ত থাকুন। আপনার সুখের পরিমাণ বাড়বে বহুগুণে।

প্রতিদিন পাঁচ পৃষ্ঠা হলেও পড়ুন

চিন্তাশীল মনন নির্মাণে পড়ার অভ্যাসের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রতিদিন বই পড়ুন, কয়েকটি পৃষ্ঠা হলেও। বিচিত্র সব বিষয় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আপনি আরো ভালোভাবে বুঝতে শিখবেন। আপনার চিন্তা গভীর হবে, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বাড়বে।

পারস্পরিক আলাপ হোক অর্থপূর্ণ ও আনন্দময়

সায়েন্টিফিক আমেরিকানের তথ্যমতে, 'পারস্পরিক কথাবার্তায় একজন মানুষ প্রতিদিন গড়ে ১৫ থেকে ১৬ হাজার শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।' এই বিপুল সংখ্যক শব্দমালার প্রভাব আমাদের জীবনে সীমাহীন। কারণ শব্দ এক প্রচণ্ড শক্তি। তাই প্রয়োজনীয় কথা ও কুশল বিনিময়ের বাইরে নিছক গালগল্পে মশগুল হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। পরিবারে ও নিজস্ব পরিমণ্ডলে আপনার কথা যেন অন্যকে অনুপ্রাণিত করে, আনন্দিত করে।

ফাস্টফুড ও বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন

বেপরোয়া তরুণ এবং রোগে ভোগা প্রবীণকে স্মার্ট বলে না; বরং সুস্থ-সবল প্রাণবন্ত কর্মব্যস্ত যে মানুষটিকে দেখে বয়স অনুমান করা কঠিন হয় তিনিই স্মার্ট। তাই স্মার্ট হোন, সুস্থ থাকতে ফাস্টফুড ও বাইরের খাবার পরিহার করুন। পরিবারে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণ শাকসবজি ও ফলমূল রাখুন।

অন্যের কল্যাণে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করুন

দায়িত্ব-কর্তব্যের বাইরে নিঃস্বার্থ ভালো কাজে যুক্ত থাকুন। দীর্ঘ গবেষণায় মনোবিদরা দেখেছেন, প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই যারা মানুষের জন্যে নিয়মিত কাজ করেন, তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ে। কমে হতাশা-বিষণ্ণতা-একাকিত্ববোধ। তাই বঞ্চিতের কল্যাণে দান করুন, স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নিন।

তথ্যসূত্র : হার্ভার্ড হেলথ ব্লগ ২৫ মার্চ ২০২০; এমএসএন ডট কম ২৪ ডিসেম্বর ২০২০

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

মানুষকে আরো দক্ষতার সাথে সেবা দিতে পারব

মোহাম্মদ আবুল মান্নান

পেশাগত জীবনে আমি কাজ করি লাইফ সেভিং ফোর্সে। পেশার কারণে দেশে-বিদেশে অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছি। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে যে তৃপ্তি আমি পেয়েছি, তা আর কোথাও পাই নি।

মেডিটেশন চর্চা করে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া—এখন মনকে প্রশান্ত রাখতে পারছি। আগে প্রায়শই আমি গামা লেভেলে থাকতাম। কোর্সের প্রথমদিন আমরা ব্রেনওয়েভ সম্পর্কে জেনেছি। সেদিন ক্লাস শেষে যথারীতি কর্মস্থলে গিয়েছি। ৩৫ জন কর্মী সেখানে কাজ করেন। আগে তাদের দিয়ে কোনো কাজ সময়মতো করাতে বেগ পেতে হতো। এবার লক্ষ করলাম, আমার পরিবর্তন দেখে তারা বেশ উৎসাহিত। এমনকি প্রতিটি কাজ এখন তারা সময়মতো শেষ করছেন।

এ কোর্সের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমি যে-কোনো দুর্যোগে জনগণকে আরো দক্ষতার সঙ্গে সেবা দিতে পারব—এই প্রত্যাশা করছি।

আরেকটি বিষয়, কোর্সের তৃতীয় দিন গুরুজী বললেন বাসায় ফিরে সবাইকে সালাম দিতে। আমি বাসায় গিয়ে আমার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে সালাম দিলাম। এর কিছুক্ষণ পর ছোট মেয়ে এসে বলল—'বাবা, আসসালামু আলাইকুম।' সালাম চর্চার ফলে আমার পরিবারে সুখ-শান্তি বেড়েছে।

[সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম। ৪৬৮ ব্যাচ]

কীভাবে সফল হবো তা জেনেছি

অনুভব রুদ্র

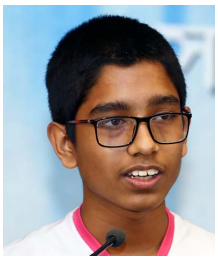

আমি ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো কোয়ান্টামের আলোকায়ন কার্যক্রমে অংশ নিই। এরপর নিয়মিত সাদাকায়ন এবং ওয়ার্কশপগুলোতে এসেছি। কোয়ান্টামে এসে আমি আগের চেয়ে ইতিবাচক হয়েছি। কীভাবে সফল হতে হবে তা জেনেছি।

আমি বাসায় নিয়মিত মেডিটেশন করতাম। এখানে আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। জীবনযাপনের বিজ্ঞান অনুসরণ করে কীভাবে জীবন গড়ব তা কোয়ান্টাম আমাকে শিখিয়েছে।

[শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি, নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। ৪৬৮ ব্যাচ]

পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এ কোর্স

রেবেকা সুলতানা

পাঁচ-ছয় বছর ধরে আমি খুব হতাশ ছিলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে মেডিটেশনে যখন ধীরে ধীরে দম নিয়েছি, প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেছি—আমি তো বেঁচে আছি, সুন্দর পৃথিবীকে দেখতে পারছি। পরিবারে ও শিক্ষার্থীদের জীবনে ভূমিকা রাখতে পারছি। তাহলে কেন চাওয়া আর না পাওয়া নিয়ে হতাশ হচ্ছি?

এ কোর্সে অংশ নিয়ে সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছি—আমার মনের অসীম শক্তি ও ক্ষমতাকে। মনে হচ্ছে, চাইলে আমি নিজের জীবনকে ইতিবাচকভাবে বদলে দিতে পারি। এ কোর্সে যদি আমি আরো আগে অংশ নিতাম, ক্যারিয়ারে হয়তো আরো ভালো করতে পারতাম। জীবনের লক্ষ্যও সুস্থির করতে পারতাম।

গুরুজীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই—ধর্মের শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের মিশেলে তিনি এ কোর্সটি সাজিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, এ জ্ঞান আমি আমার শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারব। তাদের নৈতিকতা, মানবতা বোধ জাগিয়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করতে পারব, যাতে তারা নিজের এবং দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে। আমি মনে করি, এ কোর্স পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

[সহকারী অধ্যাপক, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। ৪৬৭ ব্যাচ]

এখন অনেক ভালো আছি

রাজিয়া রহমান

আমার একটিমাত্র মেয়ে। মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ যখন ঠিক হলো, মেয়েটা হয়তো আর আমার থাকবে না—এই ভেবে সবসময় কষ্ট পেতাম। মেয়ের বিয়ের পর থেকেই আমার সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা! পা ভাঁজ করতে পারতাম না। বেশিক্ষণ শুয়ে-বসেও থাকতে পারতাম না। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু কোনো রোগ ধরা পড়ে নি।

এক ধরনের সংশয় নিয়েই আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করতে আসি। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে আমি সুস্থ বোধ করছি। মেরুদণ্ড ও ঘাড় সোজা করে বসতে পেরেছি। আগের মতো আর কলার গার্ড পরে থাকতে হচ্ছে না। এখন আমি অনেক ভালো আছি।

[গৃহিণী, চট্টগ্রাম। ৪৬৮ ব্যাচ]

মেডিটেশনের পরামর্শ দিলে প্রেসক্রিপশন সম্পূর্ণ হবে

ডা. শাকিল আহ্‌মেদ

কোর্সের কয়েকদিন আগে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে উপহারস্বরূপ একটি খাম হাতে পেলাম। খাম খুলে দেখি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের প্রবেশপত্র। স্ত্রীর অনুরোধেই এখানে এলাম এবং চার দিন পর উপলব্ধি করলাম, আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। গুরুজীর অসংখ্য উপদেশবাণী এবং জীবনে চলার পথে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা সাথে নিয়ে যাচ্ছি।

একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি প্রতিনিয়ত মানুষের সমস্যাগুলো দেখি। বর্তমানে অধিকাংশ রোগীই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। রাতে তাদের ঘুম হয় না। গুরুজীর আলোচনা শুনে মনে হচ্ছে, আমাদের প্রেসক্রিপশনটি আসলে অসম্পূর্ণ। আমরা যদি এতে মেডিটেশন চর্চা করার পরামর্শ জুড়ে দিতে পারি, তাহলে প্রেসক্রিপশন সম্পূর্ণ হয়।

একসময় আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগে কর্মরত ছিলাম। সেখানে দেখেছি ছোট ছোট শিশুরা ক্যান্সারে আক্রান্ত। এ কোর্সে এসে উপলব্ধি করলাম, ভ্রান্ত জীবনাচার এবং অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস এসব রোগের জন্যে দায়ী। আমরা নির্বিচারে শিশুদের হাতে তুলে দেই জুস, কোল্ড ড্রিংকস আর চিপসের প্যাকেট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেনেশুনে স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর খাবারগুলো আমরা তাদের খাওয়াচ্ছি। কোয়ান্টাম যে খাদ্যাভ্যাসের কথা বলছে, সেটা বৈজ্ঞানিক এবং প্রত্যেকের তা অনুসরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

আমার বিশ্বাস, যদি আমরা কোয়ান্টাম জীবনাচার অনুসরণ করি, আমাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। অনেক রোগবালাই থেকে আমরা সহজেই মুক্ত থাকতে পারব। আমরা উপভোগ করতে পারব স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন।

কোর্সে গুরুজী পারিবারিক একাত্মতার কথা বলেছেন। এখানে এসে আমি উপলব্ধি করেছি, আমাদের জীবনে পরিবারের গুরুত্ব কত বেশি। সেইসাথে জেনেছি, মা-বাবাকে কীভাবে সেবাযত্ন করব, সন্তানদের কীভাবে লালনপালন করব এবং তাদের কী শিক্ষা দেবো।

আমি মনে করি যে, এ কোর্সটি জাতীয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ এ যুগের কিশোর-তরুণদের মাঝে অনেক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। যদি আমরা শিক্ষা কারিকুলামে মেডিটেশন যুক্ত করতে পারি, শিক্ষার্থীরা জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে গোছাতে পারবে। নিজের জন্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারবে। ব্যক্তিগত জীবনে নিয়মিত মেডিটেশন অনুশীলন করলে সমাজে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা প্রত্যাশা করতে পারি।

[সহকারী সার্জন, শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ৪৬৭ ব্যাচ]

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমার সালাম নেবেন। আশা করি স্রষ্টার কৃপায় ভালো আছেন। আমিও বেশ ভালো আছি।

২০১৯ সালে আমি প্রথমবারের মতো লামা ভ্রমণ করি। মেয়ে শিশুদের আবাসন সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসার সময় দেখতাম, মেয়ে কোয়ান্টারা খেলছে, দৌড়াচ্ছে, 'সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' বলতে বলতে সারি বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত তিন বার লামা কোয়ান্টায়নে অংশ নিয়েছি। যতবারই ওদের দেখতাম, মনে হতো—এ শিশুদের কাছে যদি একটু যেতে পারতাম! ওদের জন্যে যদি কিছু করতে পারতাম!

এই সুযোগটা এলো এবছর। সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় মেয়ে শিশুদের সার্বিক দেখাশোনার জন্যে আনা হলো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারে। এ শিশুরা লামার বিশাল ক্যাম্পাসে খোলা পরিবেশে বড় হয়েছে। রাজশাহীতে এসে চার দেয়ালের মধ্যে প্রথম প্রথম এদের বেশ কষ্টই হচ্ছিল। বনের পাখিকে খাঁচায় পুরলে যে অবস্থা হয়, ওদেরও ছিল সেই অবস্থা।

তবে কোয়ান্টামের কর্মীরা সবসময় চেষ্টা করেছেন শিশুদের নানাভাবে ব্যস্ত রাখতে, আনন্দে রাখতে। আমার হঠাৎ মনে হলো, বাচ্চাদের যদি একটু গান শেখানো যায়! অনেক বছর আগে ছোটবেলায় যেটুকু শিখেছি, তা-ই না হয় শেখালাম। মোমেন্টিয়ার অনুমতি দিলেন। আরেকজন দায়িত্বশীল আপা জানালেন, তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে এবং মেয়ের শখের হারমোনিয়ামটা পড়ে আছে। ব্যস, আমার পড়ে থাকা কণ্ঠ আর আপার পড়ে থাকা হারমোনিয়াম নিয়ে শুরু হলো মেয়ে কোয়ান্টাদের গান শেখানো।

শিশুদের শেখার আগ্রহ এবং দ্রুত শেখার ক্ষমতা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। অল্প কদিনেই খুব আপন মনে হয় প্রত্যেককে। ওদের দেখলে এমনিই আমার চোখে পানি চলে আসে। আগেও মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করতাম। কিন্তু এখন দায়িত্ববোধটা আরো বেড়ে গেছে।

শিশুদেরকে দেখি আর ভাবি, কত বড় কাজ গুরুজী হাতে নিয়েছেন। যদি এই শিশুদের দায়িত্ব কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন না নিত, হয়তো ফুলের মতো একেকটা জীবন ভেসে যেত, হারিয়ে যেত অন্ধকারে। অথচ আজ ওরা লেখাপড়া শিখছে, সম্মানের সাথে ও নিরাপত্তার সাথে বেড়ে উঠছে।

নিজেকে আমার সবসময় সৌভাগ্যবান মনে হয় এমন ভালো কাজে শরিক হতে পেরে। প্রতিটি প্রোগ্রামে গিয়ে অনুভব করি—শুধু নিজেকে নিয়ে পরিবারকে নিয়ে বাঁচার কথা কোয়ান্টাম বলে না, অন্যের জন্যেও ভাবতে শেখায়।

যখনই আমি শুনি পরিচিত কেউ সমস্যায় আছে, কোনো বিপদে পড়েছে বা কারো এক্সিডেন্ট হয়েছে, আমি তার উদ্দেশ্যে মাটির ব্যাংকে দান করে দেখেছি প্রভুর ইচ্ছায় সমস্যাটা দূর হয়ে যায়। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে কেউ পড়ে আছে জানলে তার জন্যে নিজে হিলিং করি, সদকা হিলিংয়ে নাম দেই। আমি তাদেরকে বলি না। নীরবে প্রার্থনা করি, হিলিং করি, দান করি।

গুরুজী, অন্যের জন্যে কিছু করার আনন্দ যে পায় নি, তাকে এ অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। সবকিছুর জন্যে পরম করুণাময়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আমার মতো হাজার হাজার মানুষকে ভালো কাজে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্যে আপনাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। ওম শান্তি!

বিনীত
জয়ন্তী রানী সরকার
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা
৪২১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

দৈনন্দিন চর্চায় সন্তান হয়ে উঠুক শুদ্ধাচারী ও মানবিক

শিশুদের ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত কথা হলো—তারা যা দেখে তা-ই শেখে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খারাপ জিনিসগুলো যত তাড়াতাড়ি শেখে, ভালো কিছু শেখার গতি তার চেয়ে ধীর। দুঃখজনক হলেও সত্য, মা-বাবারা সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে যতটা ব্যস্ত থাকেন, তাদের মানসিক বিকাশ নিয়ে ঠিক ততটাই উদাসীন থাকেন। অথচ শৈশবে মা-বাবা কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের হাত ধরে কিছু ছোট ছোট বিষয়ের চর্চা বদলে দিতে পারে গোটা জীবনের কাঠামোটাই।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কৃতজ্ঞ থাকাকে মানব চরিত্রের সকল গুণের আধার বলা যেতে পারে। সব শিশুই যে পরিবেশে বড় হয়, জগতকে সে-রকম চোখেই সে দেখে। যেমন, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বড় হতে থাকা একজন শিশু মনে করে অন্য সকল শিশু তার মতো স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। নিজের একটি আলাদা রুম থাকলে মনে করে সমবয়সী সবার সে-রকম আছে। এ-ক্ষেত্রে মা-বাবা যদি বোঝাতে সক্ষম হন যে, অনেক শিশু সুবিধাবঞ্চিত কিংবা অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় আছে এবং তাদের কচি মনে সহানুভূতি ও মমতা জাগাতে পারেন, তবে শিশুদের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কৃতজ্ঞতা তৈরি হবে।

দানে আগ্রহী করা

শিশুদেরকে দানে আগ্রহী করে কৃতজ্ঞতাবোধকে তাদের স্বভাবে পরিণত করতে হবে। শুধু অর্থ নয়; খাবার, পোশাক, বইপত্র, খেলনা এমনকি তাদের সময়ও হতে পারে। শিশুকে বোঝাতে হবে যে, নিজের অতিরিক্ত এসব জিনিস অনেক শিশুর তিন বেলা খাবার, ঘুমানোর জায়গা ও লেখাপড়া নিশ্চিত করতে পারে। এ-ছাড়া সময়-সুযোগ করে তাদেরকে বঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসনের স্থানে নিয়ে যাওয়া উচিত।

শুদ্ধাচার শেখানো

কৃতজ্ঞতা, দান ও শুদ্ধাচারের মধ্যে গলাগলি ভাব। ঘুম থেকে উঠে স্রষ্টাকে শুকরিয়া জানানো, সবাইকে সালাম দেয়া, 'থ্যাংক ইউ, প্লিজ, এক্সকিউজ মি' বলা—শুধু আওড়ে যাওয়া নয়, শিশুকে বোঝাতে হবে স্রষ্টার দয়া না হলে আমরা ভালো থাকতে পারতাম না। সালামের মাধ্যমে তাই অন্যের শান্তি কামনা করছি। থ্যাংকস দিচ্ছি, কারণ কেউ আমার জন্যে হয়তো নিজের সাধ্যাতীত করছে। প্লিজ বলছি, কারণ কেউ আমার জন্যে কিছু করতে বাধ্য নয় তবুও চেষ্টা করছে। এক্সকিউজ মি বলে ভদ্রতা প্রকাশ করছি।

সামাজিক মেলামেশায় উৎসাহী করা

বুঝে না-বুঝে মিডিয়ার প্রভাবে শিশুদেরকে আমরা একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বানিয়ে ফেলছি। অথচ সোশ্যালাইজেশন বা সামাজিকীকরণ শিশুর জন্মের পর থেকে শুরু হয়ে যায় এবং বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে প্রভাব ফেলে। পারিবারিক বিশ্বাস, চেতনা, সংস্কৃতি যেমন শিশুর প্রাথমিক বিকাশের ভিত্তি, তেমনি বৃহৎ পরিমণ্ডলে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এমনকি অপরিচিত কারো সাথে ইন্টার‍্যাকশন বা পারস্পরিক মেলামেশা শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখে।

তবে একদিনে সবকিছু শিখিয়ে ফেলতে গিয়ে শিশুকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে ফেলাটা হবে বোকামি। ছোট ছোট ধাপে ওপরের বিষয়গুলোকে সন্তানের প্রতিদিনের রুটিনের অংশে পরিণত করতে পারলে করুণাময়ের দয়ায় সুসন্তান পৃথিবীতে রেখে যাওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

শম্পা রায়
কেলি সার্ভিস কানাডার
ইন্টারপ্রেটার এন্ড ট্রেনিং উইং-এ কর্মরত

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমি সপ্তম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। করোনাকালে স্কুল বন্ধ থাকায় পড়াশোনার পাশাপাশি বাসার বিভিন্ন কাজেও সাহায্য করতে হচ্ছে। ফলে আমার দৈনন্দিন রুটিন অনুসরণ করতে পারছি না। কীভাবে আমি রুটিন অনুসরণ করতে পারি?*

উত্তর : সন্তান হিসেবে আপনি সত্যিই ভাগ্যবান। কারণ আপনাকে বাসার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আর এ-কাজের মধ্য দিয়ে আপনি আপনার পরিবারের অংশ হয়ে উঠতে পারছেন। আপনার মা-বাবাকে ধন্যবাদ। কারণ তারা আপনাকে মেহমানের মতো করে বড় করছেন না; বরং পারিবারিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

আসলে তারাই দায়িত্বশীল মা-বাবা, যারা সন্তানকে একেবারে ছোটবেলা থেকেই পরিবারের নানা কাজে অভ্যস্ত করে তোলেন। সন্তান যে বয়সে যে কাজ করতে পারে তা যদি তাকে দিয়ে করানো হয়, তাহলে সে পরিবারের অংশ হয়ে বেড়ে ওঠে। সেইসাথে সে আত্মবিশ্বাসী স্বাবলম্বী মানুষ হতে পারে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে শেখে।

আর যে মা-বাবা সন্তানকে ননীর পুতুল বানিয়ে রাখেন, কোনো কাজ করতে দেন না, তারা আসলে নিজেরাই তাদের সন্তানের সর্বনাশ করেন। কারণ অংশীদারিত্বের অনুভূতি ছাড়া কেউ একটা জায়গাকে নিজের মনে করতে পারে না। আর এ অনুভূতি তখনই গড়ে ওঠে, যখন সে কাজের সুযোগ পায়।

জাপানিরা কী করে? জাপানি শিশু হয়তো একটা কাগজ ফেলে দিল। মা-বাবা কিন্তু সেটা ওঠাবে না। শিশুটিকে বলবে, এটা তোলো এবং ময়লার ঝুড়িতে রাখো। শিশুটিও বুঝল, ময়লা কোথায় ফেলতে হবে। অতএব যারা মা-বাবা আছেন—সন্তানকে আপনার কাজের অংশীদার করবেন। যে কাজ সে করতে পারে সে কাজটুকু তাকে করতে দেবেন।

এখন স্কুল বন্ধের সময়ে যেহেতু আপনাকে ঘরের কাজে মা-বাবাকে সহযোগিতা করতে হচ্ছে, তাই এসময়ের সাথে মানানসই নতুন রুটিন করে নিন। কারণ সময় এবং প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে রুটিন পরিবর্তন করতে হয়। আর পড়াশোনাসহ প্রতিটি কাজ আনন্দের সাথে করুন। তাহলে আপনি সবদিক থেকে ভালো থাকবেন।

প্রশ্ন : *আমার বড় ছেলে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছে। কিন্তু ঠিকমতো প্রোগ্রামে আসে না। সেজন্যে তার বাবা খুব বকাবকি করে। এখন বলে, মারের ওপর কোনো ওষুধ নাই। এভাবে মারধর করাটা কি সমাধান হতে পারে?*

উত্তর : সন্তানের ক্ষেত্রে মা-বাবার ধৈর্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের বন্ধু হতে হবে। তার সাথে যত ঘনিষ্ঠ হবেন, তত আপনি তাকে বোঝাতে পারবেন। ছেলে যদি বাবার কথা না শোনে, তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা সেই বাবার মধ্যে। তাই খুঁজে বের করুন, কেন আমার ছেলে আমার কথা শুনছে না। মারের ওপর কোনো ওষুধ নাই—এর চেয়ে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি আর হয় না। গায়ে হাত তোলার ফলে আপনার শেষ অস্ত্রটা আপনি ব্যবহার করে ফেললেন। এরপরে ছেলে বলবে, যা-ই করি বাবা তো মারবেই। ফলে শুধু ছেলের ক্ষতি হলো না, কোয়ান্টামের প্রতিও তার আগ্রহ কমে যাবে। আর আপনি যদি কোয়ান্টামের শিক্ষা অনুসরণ করেন, আজ হোক কাল হোক আপনার ছেলেও তা অনুসরণ করবে। কারণ ছেলে তো আপনাকে দেখে শিখবে।

আর মা-বাবা সন্তানকে অনেক সময় জোর করে বুঝিয়ে কোয়ান্টামে নিয়ে আসেন। সন্তান ভাবে যে, চার দিন ক্লাস করলেই হবে। চার দিনের পরেও যে মেডিটেশন চর্চা করতে হবে, এ ব্যাপারে তার তো ধারণা ছিল না। তখন সে মনে করে, আপনি তাকে একটা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলেছেন।

অতএব সন্তানের সামনে প্রতিটি বিষয়ের ভালো-মন্দ তুলে ধরুন, কিন্তু চাপিয়ে দেবেন না। সন্তানের বন্ধু হোন, পাহারাদার নয়। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, নবী-রসুলকে তিনি পাহারাদার নয়, হেদায়েতকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

তাই সন্তানের সাথে কখনো দুর্ব্যবহার করবেন না; বরং তার জন্যে দোয়া করুন। সেইসাথে তার সমবয়সী যারা মেডিটেশন করে, যারা সাদাকায়নে আসে সেই কোয়ান্টিয়ারদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিন। সাদাকায়নে গিয়ে যখন সে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অংশ নেবে, তখন তার মধ্যে ওনারশিপ বা অংশীদারিত্বের মনোভাব জন্মাবে। আর যখন সে নিজে উদ্বুদ্ধ হবে, তখন সঙ্ঘ থেকে সে সত্যিকার অর্থে উপকৃত হতে পারবে।

প্রশ্ন : *গুরুজী, আপনার একটি কথা খুব ভালো লেগেছে—'ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষকে গ্রহণ করতে হয়, খণ্ডিতভাবে নয়। এটাই বিশ্বজনীন মমতা।' পরিবারে ও সংগঠনে পারস্পরিক সম্পর্কে এখন এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা খুব প্রয়োজন। কারণ আমরা শুদ্ধাচার চর্চা করছি। ফলে অন্যের ভুলত্রুটি সহজে চোখে পড়ছে। সন্তানের কাছেও প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। শুদ্ধাচারের লঙ্ঘন দেখলে হতাশ হয়ে পড়ছি। দয়া করে এ ব্যাপারে কিছু বলবেন।*

উত্তর : কারো শুদ্ধাচারের লঙ্ঘন দেখলে হতাশ হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। আমরা শুদ্ধাচারী হওয়ার চেষ্টা করছি। কেউ এখনো পুরোপুরি শুদ্ধাচারী হয়ে যাই নি। আসলে অন্যের দিকে নয়, তাকাতে হবে নিজের দিকে। যখনই অন্যের কোনো ত্রুটি দেখলেন, তখন সেই ভুলটা আপনার মধ্যে আছে কিনা দেখুন। আর যিনি ভুল করলেন, তার জন্যে দোয়া করুন। তাহলে আপনি সহজ পথ পাবেন, শুদ্ধাচারী হয়ে উঠবেন।

সন্তানের কাছেও হঠাৎ করে অনেক বেশি পরিবর্তন প্রত্যাশা করবেন না। পরিবর্তনের জন্যে সময় দিতে হবে। তাকে মমতা দিয়ে বোঝাবেন। নিজে তার সামনে উদাহরণ হবেন। যতবার সে লঙ্ঘন করবে—তাকে সুন্দর ভাষায় বোঝাবেন।

তাছাড়া রসুল (স) কখনো মানুষের দোষের দিকে তাকান নি। তাই তাঁর সুন্নত হিসেবে আগে মানুষের গুণটাকে মূল্যায়ন করুন। তাহলে অন্যের কাছে আপনার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এরপর আপনি তার ভুলগুলো মমতার সাথে ধরিয়ে দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে পারবেন।

আপনাদের তো মনে আছে সেই ঘটনা। এক বেদুইন চোর এসে বলল, 'ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি বেশি কিছু অনুসরণ করতে পারব না। আপনি আমাকে শুধু একটি উপদেশ দিন। কিন্তু আমাকে চুরি করতে নিষেধ করবেন না।' নবীজী (স) বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি কখনো মিথ্যা বলবে না।' এরপর সে চুরি করতে বেরিয়েছে। একজন জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ? এখন সে কীভাবে বলবে যে, চুরি করতে যাচ্ছি? তার আর চুরি করতে যাওয়া হলো না। এভাবে একসময় তার চুরি করাই বন্ধ হয়ে গেল।

প্রতিটি ধর্মই সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। অন্যের ভুলের জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। প্রভুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে নিজের ভুলের জন্যে। অতএব সচেতন হতে হবে যে, নিজের শুদ্ধাচারের লঙ্ঘন হলো কিনা। এভাবে সবসময় সমমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করলে আপনি ভালো থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন।

প্রশ্ন : *মাটির ব্যাংকসহ ফাউন্ডেশনের নানা খাতে আমি নিয়মিত দান করি। এ দানের বরকতে সবসময় বিভিন্ন রকম বালা-মুসিবত, ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকছি, সেটাও প্রতিনিয়ত বুঝতে পারছি। প্রশ্ন হলো, আমার এই দানের পুণ্য কি পরকালেও আমার সাথে যাবে?*

উত্তর : পৃথিবীতে আপনি যা দান করে গেলেন সেটাই আপনার সাথে যাবে। নবীজী (স) খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, একজন মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটি জিনিস তার পেছনে পেছনে যায়। তার ধনসম্পদ, আত্মীয়স্বজন এবং তার কর্ম। কিন্তু মৃতের কাছ থেকে তার আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পদ ফিরে আসে। তার সাথে থেকে যায় শুধু তার কর্ম—সৎকর্ম হোক বা অসৎকর্ম।

সেজন্যে কোয়ান্টাম পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে বলে রাখি—আপনার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ নিজের জীবদ্দশায় ওয়াক্‌ফ করে দেবেন, সৎকাজের জন্যে দান করে যাবেন। আর বাকি দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিশদের জন্যে থাকবে। আপনার মৃত্যুর পর উত্তরসূরিরা আপনার জন্যে দান করবে—এই আশা পূরণ না-ও হতে পারে।

অতএব ফাউন্ডেশনে যে আপনি সঙ্ঘবদ্ধভাবে দান করছেন, এটা মর্যাদার দিক থেকে অনেক বড় কাজ। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে অন্য সব আমল করার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেলেও সদকায়ে জারিয়া হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধ এ দানের বরকত আপনি পেতে থাকবেন। এই সৎকর্মটুকুই আপনার সাথে যাবে, আর কিছু নয়।

এ মাসের অটোসাজেশন

প্রতিদিনই আমার কিছু করণীয় রয়েছে। আমি সুচারুরূপে আমার কাজ সম্পাদন করব।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে সুশাসন, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ

১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়ে সুশাসন, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. ওবায়দুল আজম। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামান, অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল ও এম মাকসুদ হোসাইন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের সদস্য শাহ মো. আবু রায়হান আলবেরুনী।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্যারিসে রক্তদান কর্মসূচি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিস-এর উদ্যোগে ২১ ডিসেম্বর প্যারিসের বিশা-ক্লোদ বার্নার্ড হাসপাতালে রক্ত দেন ১৮ জন রক্তদাতা।

রাজশাহীতে দাফনসেবা প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২৮ নভেম্বর রাজশাহী সেন্টারের প্রশান্তি হলে দাফনসেবা কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বয়স-শ্রেণি-পেশার ৪২ জন স্বেচ্ছাসেবী নারী-পুরুষ অংশ নিয়েছেন। এ কার্যক্রমে ইসলাম ও হিন্দু—উভয় ধর্মানুসারে মৃতের শেষ বিদায় জানানোর যথাযথ প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়।

বনানীগুচ্ছের উদ্যোগে শুদ্ধাচার-বিষয়ক সেমিনার ও স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি

বনানীগুচ্ছের উদ্যোগে ৪ ডিসেম্বর ঢাকার দক্ষিণ বাড্ডায় ঝিলপাড় পার্কে স্বাস্থ্য-সচেতন সংগঠন ভোরের পাখি এক্সপ্রেস-এর ১৭০ জন সদস্য শুদ্ধাচার-বিষয়ক সেমিনারে অংশ নেন। এ-ছাড়া স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচিতে ২৪ জন সদস্য রক্তদান করেন।

নারায়ণগঞ্জ কারাগারে কারাবন্দিদের নৈতিক উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম

৩ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে 'আত্মোন্নয়নে ধ্যান ও যোগ' ধারাবাহিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. জসিম উদ্দিন। মূলত তার উদ্যোগেই এ কার্যক্রম শুরু হলো। কারা কর্মকর্তা ও কারাবন্দিরা পর্যায়ক্রমে সবাই এতে অংশ নেবেন। এ-ছাড়াও সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ ইমতিয়াজ, জেল সুপার মাহবুবুল আলম ও জেলার জনাব শাহ রফিকুল ইসলাম এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। এতে ১০ জন কারা কর্মকর্তা ও ২০ জন কারাবন্দি অংশ নেন।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম

ঢাকার উত্তরায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রথম শ্রেণির নবনিযুক্ত ২৫ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর

চট্টগ্রামে উৎসবমুখর আলোকায়ন

চট্টগ্রাম সেন্টারে ডিসেম্বর মাসজুড়ে আলোকায়ন অনুষ্ঠিত হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। ২২ ডিসেম্বর আয়োজন করা হয় 'প্রীতি উৎসব'। গত ২৮ বছরে কোয়ান্টামের দুর্লভ কিছু ছবি, সদস্যদের ক্যামেরাবন্দি আনন্দমুহূর্ত ও প্রয়াত সদস্যদের ছবি—সবমিলিয়ে শতাধিক ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে সদস্যরা আরো একাত্ম হয়ে ওঠেন ফাউন্ডেশনের সাথে।

এ-ছাড়াও আলোকায়নে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিশু-কিশোর সেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সরোয়ার হোসেন চৌধুরী। বছরের শেষ আলোকায়নে পিঠা উৎসবের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় সবাই।

নিজের কাজ, দর্শন ও অবদান দিয়ে পৃথিবী ও সভ্যতাকে ঋণী করে গেছেন যারা—তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গুরুজী আলোকপাত করছেন ফাউন্ডেশনের নিয়মিত কার্যক্রমগুলোতে। সেই আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হচ্ছে কোয়ান্টাম বুলেটিনের ধারাবাহিক এ আয়োজনে।

এম এন রায়
বিশ্বজুড়ে শোষিতের পক্ষে নিঃস্বার্থ সৈনিক

জন্ম : ২২ মার্চ ১৮৮৭; মৃত্যু : ২৫ জানুয়ারি ১৯৫৪

১৮৫৭ সালের পর ব্রিটিশ শোষণের শেকল আরো শক্তভাবে ভারতবর্ষকে বেঁধে ফেলে। মুক্তিকামী দেশবাসীর জন্যে সে এক দুঃসহ সময়। সিপাহী বিপ্লবের ৩০ বছর পর ১৮৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণায় জন্ম নেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তার পিতা স্থানীয় আর্বেলিয়া ইংলিশ স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। শৈশব থেকে প্রবেশিকা পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ পড়ালেখা করেন এই স্কুলেই।

এরপর ন্যাশনাল কলেজের পাট চুকিয়ে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন প্রকৌশল ও রসায়ন শাস্ত্রে। এখানেই তিনি দীক্ষিত হন সশস্ত্র বিপ্লবে। গোপনে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে সদলবলে গেলেন সুন্দরবন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের প্রধান ঘাঁটি ছিল বাংলা। ইংরেজরা তাই সবচেয়ে বেশি ভয় পেত বাঙালিদের।

বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ প্রথম বন্দি হন ২৩ বছর বয়সে। জেলখানায় বসেই আরেক বিপ্লবী বাঘা যতীনের সাথে তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করলেন। এরপর জেল থেকে বেরিয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। শোষিতের অধিকার আদায়ে বেছে নিলেন এক অজানা পথ, রুদ্ধশ্বাস যাত্রা। এই নরেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে দুনিয়াব্যাপী খ্যাত হন এম এন রায় নামে।

বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে পৃথিবীর পথে পথে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার বিপ্লবীরা জার্মানদের সহায়তায় ভারতবর্ষ স্বাধীন করার পরিকল্পনা করলেন। জার্মান সরকারের সাথে আলোচনার জন্যে নরেন্দ্র ১৯১৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় গেলেন চার্লস মার্টিন ছদ্মনাম নিয়ে।

জার্মান দূতাবাসের সাহায্য না পেয়ে তিনি দুর্গম নৌ-পথে চলে গেলেন জাপানে। উদ্দেশ্য জাপানে নির্বাসিত চীনের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সান ইয়েৎ সিনের সাথে বৈঠক করা। মধ্যস্থতা করলেন জাপান-প্রবাসী আরেক বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো—জার্মানদের অর্থে কেনা চীনা অস্ত্র বিপ্লবীরা সংগ্রহ করবে আসাম সীমান্তে। নরেন্দ্র বেইজিং ছুটলেন জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাথে চুক্তি করার জন্যে। রাষ্ট্রদূত প্রস্তাব করলেন চুক্তিটি বার্লিনে স্বাক্ষর করা হোক। ফাদার চার্লস মার্টিন নামে জার্মান পাসপোর্ট দেয়া হলো নরেন্দ্রকে।

যুক্তরাষ্ট্র হয়ে তার ফ্রান্সে যাওয়ার কথা নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর পড়ালেখার জন্যে। মালয়েশিয়া ফিলিপাইন কোরিয়া হয়ে তিনি পৌঁছলেন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে। পরদিন খবরের কাগজে ছাপা হলো—'একজন বিপজ্জনক হিন্দু বিপ্লবী ও জার্মান গুপ্তচর আমেরিকায় ঢুকে পড়েছে!' নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ হোটেল ছেড়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাঙালি অধ্যাপকের বাড়িতে উঠলেন। নিজের নাম বদলে রাখলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। সংক্ষেপে এম এন রায়।

একপর্যায়ে তিনি সানফ্রান্সিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কন্যা ইভলিনকে বিয়ে করলেন। ইভলিন রাজনৈতিকভাবে তার বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে যান। পরবর্তীকালে এম এন রায় সানফ্রান্সিসকো থেকে সস্ত্রীক নিউইয়র্কে যান। সেখানে মার্ক্সবাদ নিয়ে নিবিড়ভাবে পড়াশোনার সুযোগ ঘটে তার।

বিপ্লবীদের সংগঠিত করার প্রয়াসে অতন্দ্র

১৯১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে জার্মান পাসপোর্ট তার জন্যে আর নিরাপদ থাকল না। এম এন রায় সস্ত্রীক পালালেন মেক্সিকোতে। মেক্সিকোর রাজনৈতিক কর্মী ও চিন্তাবিদদের সাথে দারুণ সখ্য গড়ে তুললেন। তবে তিনি শুধু বিপ্লবী ছিলেন না, জ্ঞানপিপাসু এ মানুষটি ১৭টি ভাষা জানতেন। স্প্যানিশ ভাষা শিখলেন এবং পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করলেন।

মেক্সিকোতে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৯১৭ সালে তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টি গড়লেন; যা ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির রূপ নেয়। মেহনতি মানুষের পক্ষে তার রচিত পার্টির মেনিফেস্টো তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। সর্বসম্মতিক্রমে এম এন রায় পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি হলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে প্রথম কমিউনিস্ট বিপ্লব করলেন। বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তবে মেক্সিকো ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল বড় একটি সাফল্য।

১৯২০ সালে মস্কোতে সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মহাসমাবেশে এম এন রায়কে আমন্ত্রণ জানালেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান লেনিন। লেনিন তখন বামপন্থীদের একচ্ছত্র নেতা। দুঃসাহসিক এম এন রায় লেনিনের তত্ত্বের বিকল্প তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। লেনিন ও এম এন রায় দুজনের তত্ত্বই গৃহীত হলো কংগ্রেসে।

তার পরবর্তী মিশন ছিল উজবেকিস্তান। দুই ট্রেন ভর্তি অস্ত্র ও রসদসহ তিনি উজবেকিস্তানের তাসখন্দে যান এবং সেখানকার স্বৈরাচারী আমিরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। মধ্য এশিয়ায় থাকাকালে তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং এ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

১৯২০-এর দশকে ভারতে চলছিল অসহযোগ আন্দোলন এবং খেলাফত আন্দোলন। খেলাফত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল তুরস্কের খলিফাকে সাহায্য করার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে লোক পাঠানো। তাদের সাথে একদল বিপ্লবী আফগানিস্তান হয়ে তাসখন্দে প্রবেশ করল। এম এন রায় তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিলেন। গেরিলা যুদ্ধে তারা ইরানের খোরাসান থেকে ব্রিটিশ বাহিনীকে উৎখাত করল।

উজবেকিস্তানে এম এন রায়ের নেতৃত্বে গঠিত সোভিয়েত সরকারের প্রভাব বলবৎ ছিল ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। এরপর লেনিন মারা গেলে ক্ষমতায় এলেন জোসেফ স্ট্যালিন। তার সাথে এম এন রায়ের চিন্তাভাবনার মিল হলো না। ১৯২৯ সালে স্ট্যালিন তাকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করলেন।

এম এন রায় আবার নাম বদলালেন। এবার ড. মাহমুদ নাম নিয়ে ফিরে এলেন ভারতে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর। তক্কে তক্কে অপেক্ষা করছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। ধরা পড়লেন এম এন রায়। ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন তিনি।

মানবতাবাদী বিপ্লবের এক অভিনব ধারণা

নিভৃত কারাগারে এম এন রায়ের চিন্তাজগতে বিপুল পরিবর্তন আসে। ইসলাম ধর্ম নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনার সুযোগ পেলেন এসময়। জেলে বসেই তিনি লিখলেন *দ্য হিস্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম*। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে একজন সমাজবিপ্লবী হিসেবে এই বইটিতেই প্রথম আখ্যায়িত করা হয়। তার মতে, ইসলামের অভ্যুদয় মানবতাকে রক্ষা করেছিল। সমাজের অধিকার-বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের ক্ষমতায়ন করেছিলেন নবীজী (স)। ইসলামের আবির্ভাবের আগে সামাজিক ন্যায়বিচারের কোনো ধারণা ছিল না। সামাজিক সম্পর্কের চিরায়ত ধারণাগুলোকে আমূল বদলে দেয় ইসলাম। ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল। কারণ শ্রমিকরাও মুনাফার একটা ন্যায্য অংশ পেত।

পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্য পরস্পরকে পরাজিত করার জন্যে দেড় হাজার বছর যুদ্ধ করেও সফল হয় নি। অথচ নবীজীর (স) বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ কিছু মানুষ মাত্র ১৫ বছরে দুই সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিল।

কারামুক্ত হওয়ার পর এম এন রায় গতানুগতিক রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে সরে আসেন। র‍্যাডিকেল হিউম্যানিজম বা বিপ্লবী মানবতাবাদ নামে একটি অভিনব ধারণা তিনি দেন—যা মানুষকে তার আত্মপরিচয় জানতে ও মুক্তির উপায় অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করে।

১৯৫৪ সালে ভারতের দেরাদুনে মারা যান এম এন রায়। আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক এই বিপ্লবী ছিলেন শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের নিঃস্বার্থ সৈনিক—যিনি শোষিতের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে ঘুরেছেন সারা পৃথিবী।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জানুয়ারি ২০২১ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd